سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ① بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ② ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ
ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤
اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوْجٍ ⑥ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ⑦ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑧
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ⑨
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ⑩ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ⑪ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ
الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ⑫ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ⑬ وَّاَصْحٰبُ
الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ⑭
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑮

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—

(১) ক্বাফ। সম্মানিত কোরআনের শপথ; (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর কাফেররা বলে ঃ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। (৩) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না — আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, (৮) এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা এবং সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

সূরা ক্বাফ

সূরা ক্বাফের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তুর উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুমআর খোতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।—(মুসলিম-কুরতুবী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুই ঈদের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন।—(সূরাটি বেশ বড়,) কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায হাল্কা মনে হত।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর তেলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসুল্লীদের কাছে হাল্কা মনে হত।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তশ্চক্ষে দেখা অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে।—(বয়ানুল-কোরআন)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেয়। কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্রিত করার সাধ্য কার আছে? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্ তাআলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানব দেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্ তাআলা এমন তৈরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান

সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ওষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্রিত করা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব-সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'লওহে-মাহফুযে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহ্রে-মুহীত)

فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ অভিধানে مَرِيج শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) مَرِيج শব্দের অনুবাদ করেছে ফাসেদ ও দুষ্ট। যাহ্হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুওয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্ কথার জওয়াব দেয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সর্বসময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ - فُرُوج শব্দটি فرج এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেনঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয়'শ বছর পর্যন্ত তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

وَأَصْحَابُ الرَّسِّ কারা?ঃ رس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رس বলা হয়। وَأَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আযাবের পর সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আঃ)- ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حضرموت (হাযারা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছেঃ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ অর্থাৎ, তাদের অকেজো কূয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

ثَمُودُ হযরত সালেহ (আঃ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।

عَادٌ —বিশালবপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্চার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

وَإِخْوَانُ لُوطٍ —হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ — ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

وَقَوْمُ تُبَّعٍ ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোব্বা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেয়া আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও খোদায়ী জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَ
جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ
وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ
لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾
هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (২৯) আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব ; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে ঃ আরও আছে কি? (৩১) জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ; (৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত। (৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী-একথার তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ – অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় ورید শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (এক) যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই ورید বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ্ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী ورید শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে ورید বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেয়া হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে, আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ الله معنا অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন। হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

এবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্মফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এরূপ মুমিন "আল্লাহ্‌র ওলী" বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্ তাআলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তাআলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা বোঝানো হয়নি। বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে ঃ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ – **تلقى** শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন করে নেয়া। فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ, নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে **متلقيان** বলে দুই জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ অর্থাৎ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيدٌ শব্দটি **قاعد** (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيدٌ এর অর্থ **قاعد** হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, **قاعد** শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَعِيدٌ শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সংগে থাকে, তাকে قَعِيدٌ বলা হয় – উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরোক্ত ফেরাশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সংগে থাকে – সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাফ ইবনে কায়সের (রহঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা-শুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।-(ইবনে-আবী হাতেম)

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ্ বলেন ঃ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকেই আলী-ইবনে আবী তালহার (রাঃ) এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়াতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা ঃ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ

تَحِيدُ – سَكْرَةُ الْمَوْتِ এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবু বকর ইবনে আম্বারী (রহঃ) হযরত মসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় ঃ اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر অর্থাৎ, আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) শুনে বললেনঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন ঃ لا اله الا الله ان للموت سكرات অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

بِالْحَقِّ – এখানে با অব্যয়টি **تعديه** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই।-(মাযহারী)।

ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ – تَحِيدُ শব্দটি **حيد** থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয় ঃ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ —এই আয়াতের পূর্বে কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَائِقٌ থাকবে। سَائِقٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيدٌ এর অর্থ সাক্ষী। سَائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شَهِيدٌ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারও কারও মতে সে-ও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কেরামুন-কাতেবীন

ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

وَّشَهِيدٌ সম্পর্কে কেউ বলেন ঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ কেউ وَّشَهِيدٌ বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খোতবায় এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে-যায়েদ (রাঃ) থেকেও তাই- বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত না ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর (রহঃ) ইবনে-কাসীর প্রমুখের মতে মুমিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন ঃ الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا অর্থাৎ, আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ —— এখানে সংগী অর্থ সেই ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কেয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌছানার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِقٌ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেয়া হয়েছে। তাকে شَهِيدٌ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরয করবে ঃ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ — অর্থাৎ, তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন ঃ এখানে قَرِينٌ শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ - أَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন।—(ইবনে কাসীর)।

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ - قَرِينٌ -শব্দের দ্বারা আসলে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্তরঙ্গভাবে সংগে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয় যেমন মানুষের সংগী হয়ে থাকে, তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলোচ্য আয়াতে قَرِينٌ বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে ; তখন এই শয়তান বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি ; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎকাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ — অর্থাৎ, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ —আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি।

أَوَّابٍ কারা ঃ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ —— অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ এর জন্যে রয়েছে। أَوَّابٍ এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, শা'বী ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই أَوَّابٍ হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন ঃ أَوَّابٍ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে ঃ

سبحان الله وبحمده اللهم انى استغفرك مما اصبت من مجلسى هٰذا

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ও তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্, আমি, এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্। তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ حَفِيظٍ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে حَفِيظٍ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার বিবিধ-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে, সে أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ —(কুরতুবী)।

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ —আবু বকর ওয়াররাক বলেন ঃ مُّنِيبٍ (বিনীত) এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্ তাআলার আদবকে সর্বদা চিন্তায়

الذّٰرِيٰت ٥١ ৫২১ حٰمٓ ٢٦

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم
مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ
قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ
سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا
أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ
أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

(৩৫) তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও। (৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

সূরা আয-যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে—

(১) কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا —অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে। অর্থাৎ, চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)।

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ —অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রাঃ) বলেনঃ এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাত লাভ করবে।—(কুরতুবী)।

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ – فَنَقَّبُوا শব্দটি تنقيب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَّحِيصٍ এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা ঃ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ —হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে "কলব" বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ – القاء سمع এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شَهِيدٌ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কামেল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয়

প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ – سَبِّحْ শব্দটি تسبيح থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আছরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের নামায। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)।

সেসব তসবীহ্ও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মাযহারী)।

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ —হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ سجود বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।-(বোখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, وَأَدْبَارَ السُّجُودِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)।

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ —অর্থাৎ, যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন ঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মাযহারী)।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যাদ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বলেন ঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا —অর্থাৎ, যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়তে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আঃ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কেয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ —অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।" উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اللّٰهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يابر يارحيم

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়।

সূরা আয-যারিয়াত

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কেয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। (এক) وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (দুই) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (তিন) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا এবং (চার) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও আলী মোর্তাযা (রাঃ)-এর উক্তিতে এই বস্তু চুতষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا-এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী ; অর্থাৎ, যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে স্বচ্ছলগতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বণ্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসূর)।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ
مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي
الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾
فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ
عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ
عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

(৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য। (২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম, তখন সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ব মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল ঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল ঃ তারা বলল ঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল ঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ — حبك শব্দটি حبكة এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই ঃ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ —বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদের-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন "বিভিন্ন রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।—(মাযহারী)।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ — أفك -এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। عَنْهُ এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ — خراص -এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে "মিথ্যাবাদীর দল" বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

এবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ

مَا يَهْجَعُونَ — يهجعون -শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও এবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ্, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে ما শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামায ইত্যাদি এবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে এবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রাঃ)-এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)।

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ —অর্থাৎ, মুমিন পরহেযগারগণ রাত্রির শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। اسحار শব্দটি سحر এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ —সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন ঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?—(ইবনে-কাসীর)।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার আধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের এবাদতকে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।—(মাযহারী)।

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ঃ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকিগণ কেবল দৈহিক এবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক এবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক এবাদত وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নির্দশনাবলী রয়েছে ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ —অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মুমিন পরহেযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কেয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর-মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং موقنين-এর অর্থ আগের متقين-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ —এস্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাযের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ "লওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ইবরাহীম (আঃ) জওয়াবে বললেন سَلَامٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আঃ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُنْكَرُونَ - منكر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্কেও منكر বলা হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক! এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ - راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ عَجُوزٌ عَقِيمٌ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ كَذَٰلِكِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স একশত বছর ছিল।—(কুরতুবী)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ
إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ
عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ
هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَ
السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

(৩১) ইবরাহীম বলল ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে-লূতের উপর আপতিত আযাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আঃ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ অর্থাৎ, ফেরাউন মূসা (আঃ) –এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আঃ)-এর বাক্যে أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ – ايد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবুবকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। — (কুরতুবী)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ
مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾
أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن
يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

سورة الطور مكية وهي تسع واربعون اية وفيها ركوعان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴿٣﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾
مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾
فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ
يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

(৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে ঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। (৫৬) আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ তাআলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই ওরা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব, কাফেরদের জন্যে দুর্ভোগ সেই দিনের, যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওদেরকে দেয়া হয়েছে।

সূরা আত্ তূর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) কসম তূরপর্বতের, (২) এবং লিখিত কিতাবের, (৩) প্রশস্ত পত্রে, (৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের, (৫) এবং সমুন্নত ছাদের, (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের, (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছেমিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে ঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। (এক) যাকে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোন কাজ করা অসম্ভব। (দুই) আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল এবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে এবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বলাবাহুল্য,যারা মুমিন, তারা কমবেশী এবাদত করে থাকে। যাহ্‌হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এই আয়াতের এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ — এই কেরাত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে এবাদত করার আদেশ দেই। আল্লাহ্‌র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ সবাইকে এবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক খোদাপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে এবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। "প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ" করার অর্থ অধিকাংশ আলেমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতা-মাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও

মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড়লোকই হোক না কেন – কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পন করবে। আল্লাহ্ তাআলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوبًا শব্দের আসল অর্থ কূয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কূয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوبٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

সূরা আত্ব-তূর

وَالطُّورِ —হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরেসিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি—(কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ . رَقٍّ — শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ —আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে পৌছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তাআলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ — مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ —অর্থাৎ, চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী, ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে-উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল। —(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ مسجور – এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। —(ইবনে কাসীর)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ — আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লেখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম বলেন ঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে মদীনা পৌছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا —অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

أَفَسِحْرٌ هٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا
سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ إِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ
أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾
وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا
كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ
كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
نَدْعُوْهُ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ
رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾

(১৫) এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে ঃ আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। (২৯) অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় ঃ সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ —অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়—যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মাযহারী)

সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের (রহঃ) বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবে ঃ পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক।—(ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরককে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে ঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَآ أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ — ايلات ও الت এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই ঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ — অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।—(ইবনে-কাসীর)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا
صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ
فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ
لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

(৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফের, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তাআলা তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে ঃ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস পতিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে-জরীর (রহঃ) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
كل شئ قدير . سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
ولاحول ولا قوة الا بالله

এরপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে।—(ইবনে-কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা ঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ''যখন দণ্ডায়মান হন''—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে— سبحانك اللهم وبحمدك — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ্ ও তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভাল-মন্দ কথা-বার্তা হয়, সে যদি মসলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ্ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
واتوب اليك (তিরমিযী—ইবনে-কাসীর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ —অর্থাৎ, রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরেব ও এশার নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَإِدْبَارَ النُّجُومِ অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)।

সূরা আত্ব-তূর সমাপ্ত

سورة النجم مكية وهي اثنتان وستون آية وثلاث ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥ ذُوْ
مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۝٩ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى ۝١٠ مَا
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ۝١١ أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً أُخْرٰى ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ۝١٥
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝١٧
لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝١٨ أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۝١٩
وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ۝٢٠ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ۝٢١
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ۝٢٢ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ
وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ
الْهُدٰى ۝٢٣ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۝٢٤ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْأُوْلٰى ۝٢٥

সূরা আন-নাজ্‌ম

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) উর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। (১৬) যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। (১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? (২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্‌র হাতে।

সূরা আন-নাজ্‌ম

সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় ঘোষণা করেন।—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলমান ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সেজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।—(ইবনে-কাসীর)।

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى —নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং বহুবচন نجوم কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর ''সুরাইয়া'' অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। কাররা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তা-ই অবলম্বন করা হয়েছে। هَوٰى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র পথের দিকে হেদায়েত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى — এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন; তাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি।

রসূলের পরিবর্তে সংগী বলার রহস্য ঃ এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিকতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে-পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার

প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুওয়ত দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى — অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ্ তাআলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (এক) যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। (দুই) যার কেবল অর্থ আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ্। এরপর হাদীসে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ্ তাআলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয় ; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সব কথাই যখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল না'; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى — এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ ঃ এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। (এক) আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্‌র দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, فَاسْتَوٰى এবং دَنَا فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মযহারীতে এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। (দুই) অন্যান্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ ঃ

শা'বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—(ইবনে-কাসীর)।

সহীহ্ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুলবারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (রহঃ) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্য এরূপ ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি।—(ফতহুল-বারী ৮ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ)।

সহীহ্ বোরখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আয়ারেত অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى তিনি জওয়াবে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (রহঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বক্তব্য ঃ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ সূরা নজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ

দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবুযর গেফারী, আবু হোরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ

ঃ আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটতবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ, (সাঃ) আপনি আল্লাহ্ তাআলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আঃ) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—(ইবনে-কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى —আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নববী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল-বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى — مرة শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতেকরে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوٰى এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে উর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى — دنا শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং تدلى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। قَابَ قَوْسَيْنِ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ, প্রায় দুই হাত বা একগজ। এরপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধরণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আঃ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى — এখানে اَوْحٰى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এবং عَبْدِهٖ-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জিবরাঈল (আঃ)-কে শিক্ষক হিসেবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى — فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্দি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্দি করা বোধশক্তি কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কলব' (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে কলব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

পাকের لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى — نَزْلَةً اُخْرٰى এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাহা শব্দের অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে-আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى — مَاوٰى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَاوٰى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান ঃ এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে ; সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى – অর্থাৎ, যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى — زَاغَ শব্দটি زيغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া। طغى শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। এতে সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিতে বিভ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—(এক) দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। مَا زَاغَ বলে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। (দুই) দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وَمَا طَغٰى বলা হয়েছে।

যারা উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) হলেন ওহীর মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

আল্লাহ্র দীদার ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মুমিনগণ আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম ও

শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তাআলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (রহঃ) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-এর মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে-কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে-হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন ঃ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়ঃ। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নবুওয়ত, রেসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্‌র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহ্‌র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওযযা কোরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী-হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।—(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ — ضِيزَىٰ শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن
بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ
أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا
أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ
قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ
بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

(২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়। (২৯) অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী? (৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না, (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমাপূজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। "একীন" তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে "যন" তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে "একিনিয়্যাত" তথা দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য – প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব – এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খট্‌কা নেই।

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ ...... مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ, যারা আমার স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকালে ও কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সাঃ) – এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহে মিনহা।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لمم শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নেসার আয়াতে একে سيئات বলা হয়েছে। إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। (দুই) এর অর্থ সেসব গোনাহ্, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা

থেকে তওবা করতঃ চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে-কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না।

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

أَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِين এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় ; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনি গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেযগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভাল-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে একথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى — অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজ-কর্মের উপর নয়। খোদাভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমা (রাঃ)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ আয়াত তেলাওয়াত করতঃ এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ইমাম আহমদ (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন ঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর ঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, খোদাভীরু। সে আল্লাহ্র কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।

শানে নুযূল ঃ দুররে-মনসূরে ইবনে-জরীর (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্ততঃ করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম ওলীদ ইবনে-মুগীরা লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى — এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

أَكْدَى — শব্দটি كُدْيَة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أَكْدَى এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى —— শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? এই ধারণা খণ্ডন করার জন্যে বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যাদ্দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তদস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়।

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى — এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিশেষগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وَفَّى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আঃ) এর বিশেষগুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وَفَّى শব্দের এই তফসীর ইবনে-কাসীর, ইবনে-জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وَفَّى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ খোদায়ী বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রেসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণতঃ আবু ওসামা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁকে বললেন ঃ তুমি জান এর মতলব কি? আবু ওসামা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)–ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ অর্থ এই যে, وفى عمل يومه باربع ركعات فى اول النهار অর্থাৎ, তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে–কাসীর)

তিরমিযীতে আবু যর (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন ঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার রাকআত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)–কে ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল–বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ – (ইবনে–কাসীর)

মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষাঃ কোরআন পাক পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই যে, এই উম্মতের জন্যেও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্নকথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেইসব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই ঃ

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ এবং وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

— وزر শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ অর্থাৎ, কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে ধৃত করা হবে না ঃ এই আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কেয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে গোনাহে অপরকে ধৃত করার কোন সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ এর সারমর্ম এই যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত ঃ এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

উপরে মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা–ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ
رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ
أَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ
إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَ
أَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ
الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ
سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا
سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

(৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান, (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। (৪৬) একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং সামূদকেও ; অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেননি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব আল্লাহ্কে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর।

সূরা আল-ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫৫

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ — অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যতঃ কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তাআলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় অনুমতিও নেই ; যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তাআলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর ; তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ – অর্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ — غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اغناء শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। أَقْنَىٰ শব্দটি قنية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ – شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলাই ; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ — 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—(মাযহারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর

শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তারা হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ – مؤتفكة এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আঃ) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ – অর্থাৎ, আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মূসা (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ — تمر শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্ তাআলার একটা নেয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ – هذا শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা হয়েছে। অর্থাৎ, ইনি অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ অর্থাৎ, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ কেয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

هَٰذَا الْحَدِيثِ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন স্বয়ং একটি মোজেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যেও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ — سمود এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এস্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا — অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা নজম পাঠ করতঃ তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কোরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সেজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সেজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সেজদা থেকে ছিল বিরত, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

সূরা আল-ক্বামার

পূর্ববর্তী সূরা নাজম أَزِفَتِ الْآزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলে শুরু করা হয়েছে। এরপর কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযায় আলোচিত হয়েছে। কেননা, কেয়ামতের বিপুলসংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ আমার আগমন কেয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কেয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এই মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কেয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহ্র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কেয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা ঃ মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তাঁর রেসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের وَانشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (রহঃ) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কার মিনা নামক

স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তাআলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

ঃ মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।—(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে-জরীর (রহঃ)ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লেখিত আছে ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।—(ইবনে-কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষরাত্রি ছিল। তখন সাধারণতঃ সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য "তারীখে-ফেরেশতা" গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ — مُّسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে مر ও استمر চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহঃ) এস্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُّسْتَمِرٌّ শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক (রাঃ) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ — استقرار এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۙ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا
تُغْنِ النُّذُرُ ۙ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَیْءٍ نُّكُرٍ ۙ﴿٦﴾
خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ﴿٧﴾
مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿٩﴾
فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ ۖ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ ۚ
وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ﴿١٣﴾ تَجْرِیْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ
كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ
وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ
عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا
فِیْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ
مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
فَقَالُوْۤا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

(৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফেররা বলবে ঃ এটা কঠিন দিন। (৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল ঃ এ তো উন্মাদ। তারা তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল ঃ আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৮) আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ — এর শাব্দিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আঃ)–কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আঃ)–কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল ঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত করেন, নূহ (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে–ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ্‌, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যম দিয়ে অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ — অর্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্‌ তাআলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ — اَلْوَاحٍ শব্দটি لوح এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা دسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ — ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ (এক) মুখস্থ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের–যবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেযের বুকে আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্যে কোরআনকে সহজ করা হয়নি ঃ আলোচ্য আয়াতে يسرنا এর সাথে للذكر সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ
غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا
فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ
اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

(২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৬) এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোঁয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৩৭) তারা লূতের (আঃ) কাছে তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (৩৯) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (৪০) আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল?

পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ وَّسُعُرٍ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ বাক্যাংশে। এখানে وَّسُعُرٍ এ অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ — مراودة শব্দের অর্থ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত (আঃ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আঃ) বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কেয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্যে পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আগমনের চিত্র অংকন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ অর্থাৎ, এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ
فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَ
كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

(৪৫) এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে ঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। (৫৫) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সূরা আর রহমান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করুণাময় আল্লাহ্ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

উপর যখন আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিতাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্যে এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زبور বলা হয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নামও যবুর। أَدْهَىٰ এর অর্থ অত্যধিক ভয়াবহ এবং وَأَمَرُّ শব্দের অর্থ তিক্ততর। এটা مر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও امر ও امر বলা হয়। وَسُعُرٍ শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اشياع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ; অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা مَقْعَدِ এ অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صِدْقٍ এ অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মসলিসে মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ — قدر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একইরূপ তৈরী করেননি —দৈর্ঘ্য পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি খোদায়ী তকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার

করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবু-দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনাঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতে কিছুলোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না। (রূহুল-মা'আনী)

সূরা আররাহমান

সূরার যোগসূত্র এবং فَبِأَيِّ آلَاءِ **বাক্যটি বার বার উল্লেখ করার তাৎপর্যঃ** পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ বাক্যটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ দানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্যে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا বাক্যটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এ বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লামা সুয়ূতী এ ধরনের পুনরুল্লেখের নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজন স্বীকৃত কবিদের কাব্যের এর নযীর পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর রূহুল-মা'আনীতে এস্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আর রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তেলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠতঃ ربنا لا نكذب بشئ من نعمك فلك الحمد অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তৎপর্য এই যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করতঃ وَمَا الرَّحْمَٰنُ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই রহমান শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। عَلَّمَ الْقُرْآنَ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّمَ ক্রিয়াপদের দু'টি কর্ম থাকে- 'এক' যা শিক্ষা দেয়া হয় এবং 'দুই' যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ, কাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্টজগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্ম শিক্ষা দেয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ মানবসৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার একটি বড়- অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাগ্রে। কোরআন শিক্ষা দেয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টির কথা পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার এবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য, খোদায়ী শিক্ষা ব্যতীত এবাদত হতে পারে না। কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব, এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছেন।

মানবসৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত, যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা,লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যতঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا আয়াতের তফসীরও।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। حسبان শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حسبان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবে উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয়নি।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ — কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نجم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ্ তাআলার সামনে সেজদা করে। সেজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সেজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(রুহুল-মা'আনী, মাযহারী)।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ — رفع ও وضع দু'টি বিপরীত শব্দ। رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ, মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবী শান্তি ও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই হবে।

হযরত কাতাদাহ্, মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায় বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেন-দেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লাবিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর। قسط এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওজনে কম দেয়া হারাম।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে انام বলা হয়।—(কামুস)

বায়যাভী বলেন ঃ যার আত্মা আছে, সেই انام আয়াতে انام বলে বাহ্যতঃ মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا বলে তাদেরকে বার বার সম্বোধনও করা হয়েছে।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ - فَاكِهَةٌ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবতঃ মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশে খাওয়া।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ - اكمام। শব্দটি كم এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ - حب এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভিরতে আল্লাহ্‌র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবতঃ আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن
مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ
رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا
تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোননা কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে। (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে। (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে। (৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

وَالرَّيْحَانُ এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (রহঃ) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের ও সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت لا طلب ريحان الله অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র রিযিক অন্বেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - آلاء শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। صَلْصَالٍ এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ - جان এর অর্থ জিন জাতি। مَّارِجٍ এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مشرقين ও مغربين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ - مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্ তাআলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলা হয়েছে: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ অর্থাৎ, উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্র কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ - لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মনিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে জাতি ও মনিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়-মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা

প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখানে থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ — جوارى . جارية শব্দটি এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। منشئات শব্দটি نشا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল এবং সেটি পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

وَجْهُ رَبِّكَ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে وجه আল্লাহ তাআলা সত্তা এবং শব্দের رَبِّكَ সম্বোধন সর্বনাশ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে عبده এবং কোথাও رَبِّكَ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জ্বিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ وَجْهُ رَبِّكَ এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী যা আল্লহ তাআলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং মানুষের সেই সব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্‌র জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।—(মাযহারী, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ — অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ অর্থাৎ, সেই পালনকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষতঃ দরিদ্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না ; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ —বাক্যটি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদের রেওয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ
তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।)—মাযহারী।

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ —অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি যাঞ্ছা করে। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না ; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। كُلَّ يَوْمٍ শব্দটি يسئل বাক্যর ظرف অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের এই যাঞ্ছা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্টজীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই كُلَّ يَوْمٍ এর সাথে هُوَ فِي شَأْنٍ ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্ছিত করেন, কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করেন দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ — ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انى تارك فيكم الثقلين অর্থাৎ, আমি দু'টি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্যে সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়াতে كتاب الله وعترتى বলে এবং কোন কোন রেওয়াতে كتاب الله وسنتى বলে উল্লেখিত বিষয় দু'টি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عترتى বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়াত ও

সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের কর্মপতি। যে হাদীসে সুন্নত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কেরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা ; এই হাদীসে ثقلين বলে দু'টি ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سَنَفْرُغُ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ, কর্মব্যস্ততা। فراغ শব্দ থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়—(এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্যে বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنَفْرُغُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যে বলা হয় ঃ আমি এই কাজের জন্যে অবসর লাভ করেছি ; অর্থাৎ, এখন একাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব আল্লাহ্র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ ও ইনছাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।—(রূহুল-মা'আনী)

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثقلين শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে ; অর্থাৎ, সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثقلان এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা ও ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ —হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ ধুম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شواظ এবং অগ্নিবিহীন ধুম্রকুঞ্জকে نحاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেয়া হবে। কোথাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধুম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন তফসীরবিদ ধুম্রবিহীন এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে-কাসীর)।।

فَلَا تَنتَصِرَانِ —এটা انصار থেকে উদ্ভুত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জিন ও মানবের মধ্যে থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ
الْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا
الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾

(৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পলনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু' টি উদ্যান। (৪৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। (৫১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। (৫৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দু' টি ছাড়া আরও দু' টি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ —অর্থাৎ, সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তাআলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করবে? হযরত ইবনে আব্বাস এই তফসীর করেছেন মুজাহিদ বলেন ঃ অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা তালামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ — سيما শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نواصى শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্যে, একথা وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলাবাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ অর্থাৎ, পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা, দুররে-মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল-কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ এবং وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

অর্থাৎ, স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্যে এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্যে। এছাড়া 'দুররে-মনসূরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে — অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِيٰنِ তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتٰنِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুনঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ — অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে হিসাবের জন্যে উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপকর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ্ তাআলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ –এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ, উদ্যানদ্বয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লেখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ —প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٌ বলা হয়েছে। زَوْجٰنِ – এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে – শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। —(মাযাহারী)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ – طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব রমণী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। (দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ —নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর এরশাদ হয়েছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎকর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল যা দেয়া হয়েছে।

مُدْهَآمَّتٰنِ —ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهام বলা হয়। অর্থাৎ, এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ — বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٧ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ٦٨
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٩ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ٧٠ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ٧٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ٧٣ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٧٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ٧٥ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٦ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٧٨

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٢ خَافِضَةٌ
رَافِعَةٌ ٣ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ٤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ٥
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ٦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ٧ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ٩
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ١٢ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ١٤
عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ١٥ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٦

(৬৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। (৬৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (৭৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

সূরা আল-ওয়াক্বিয়া
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৬

(১) যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা। (৯) এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে, (১৫) স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ - خَيْرَاتٌ এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حِسَانٌ এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ - رَفْرَفٍ এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। – (কামুস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ্ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عَبْقَرِيٍّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আল্লাহ্ তাআলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

সূরা ওয়াক্বিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ঃ অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন ঃ ইবনে-কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মুমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হযরত ওসমান — ما تشتكى আপনার অসুখটা কি?

হযরত ইবনে মাসউদ — ذنوبى আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী — ما تشتهى আপনার বাসনা কি?

ইবনে মাসউদ — رحمة ربى আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী — আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

ইবনে মাসউদ – الطبيب امرضنى চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমান গনী — আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

ইবনে মাসউদ — لاحاجة لى فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গণী – উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মাসউদ — আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস

করবে না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ — ইবনে কাসীর বলেন ঃ ওয়াক্বিয়া কেয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ - كَاذِبَةٌ শব্দটি عاقبة-এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কেয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।— (রুহুল-মা'আনী)।।

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবেঃ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ইবনে-কাসীর বলেন ঃ কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আঃ)-এর ডানপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আঃ)-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ —ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা জান কি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবূল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ سابقين তথা অগ্রবর্তীগণ বলেন পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন (রহঃ) – এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এসব উক্ত স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎকাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেয়া হবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ - ثُلَّةٌ শব্দের অর্থ দল। যমখশরীর মতে বড় দল।— রুহুল-মা'আনী)।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তীও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে—নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দুরকম উক্তি করেছেন। (এক) হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপেও তাই নেয়া হয়েছে। হযরত জাবের এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বিস্ময় সহকারে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ

اسمع ياعمر ماقد انزل الله ثلة من الاولين وثلة من الاخرين الا وان من ادم الى ثلة وامتى ثلة ـ

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন — পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কমসংখ্যক হব। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি নাযিল হয়। তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের মোকাবেলায় এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে — (ইবনে-কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর (রাঃ) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা যখন ثلة (বড়দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুলসংখ্যক। কাজেই তাঁদের মোকাবেলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

(দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সমপ্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীরগ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে — একথা মেনে নেয়া যায় না। তাই একথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে-কাসীর হাসান বসরী (রহঃ)- এ উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা আসহাবুল-ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েতে অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তীগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ من مضى من هذه الامة অর্থাৎ, পূর্ববর্তীগণ হচ্ছেন এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ হোক। (ইবনে-কাসীর)

রূহুল-মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বাকরা (রাঃ) -এর রেওয়াতেক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

ঃ একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তির তফসীর প্রসংগে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মোহাম্মদী হবে।— (রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে — এটা সুদূর পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

انتم تتمون سبعين امة انتم اخيرها واكرمها على الله تعالى

— তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে — এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম ঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ والذى نفسى بيده انى لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة — যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।— (বোখারী-মাযহারী)

জান্নাতীগণ মোট একশ বিশ' কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবিশষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ হয়েই থাকে।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ — ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, مَّوْضُوْنَةٍ-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ
مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَ
مَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَ
فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ
مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ
وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا
يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۙ إِلَىٰ
مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

(১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা (১৮) পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, (২৪) তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। (৩৫) আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্কা (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্যে। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত ঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব। (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও। (৪৯) বলুন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ —অর্থাৎ, এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খেদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে।—(মাযহারী)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ - اكواب শব্দটি كوب এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اباريق শব্দটি ابريق এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। كاس এর অর্থ সুরা পানের পেয়ালা। معين -এর উদ্দেশ্য এই যে, এই পানীয় একটি ঝরণা থেকে আনা হবে।

لَّا يُصَدَّعُونَ — এটা صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথা ব্যাথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরা-উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

وَلَا يُنزِفُونَ - نزف এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ -অর্থাৎ, রুচিসম্মত পাখির মাংসে। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর মাংস খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। —(মাযহারী)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ —মুমিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানপার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তাআলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল-ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মুমিনের জন্যে জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। —(মাযহারী)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ —জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য, ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্তবিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْرٍ এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَّخْضُودٍ -এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। وَطَلْحٍ এর অর্থ কলা مَّنضُودٍ -কাঁদি وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে, অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ -এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ — প্রচুর ফল ; অর্থাৎ, ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ — দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল

গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে—কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ — فرش শব্দটি فراش -এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়তঃ স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للفراش —পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত—(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী مَّرْفُوعَةٍ এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هن সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল ; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেয়া হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেতকেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে ? আমি আরয করলাম ঃ সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রসচ্ছলে বললেনঃ لا يدخل الجنة عجوز -অর্থাৎ, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না ; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।—(মাযহারী)

أَبْكَارًا — এটা بكر এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرُبًا — এটা عروبة — এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

أَتْرَابًا — এটা ترب — এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।—(মাযহারী)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ এবং اولين ও اخرين -এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হযরত আদম (আঃ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اخرين তথা পরবর্তীগণ বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে ; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثُلَّةٌ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿۵۲﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿۵۳﴾
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿۵۴﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿۵۵﴾
هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿۵۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿۵۷﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿۵۸﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۵۹﴾
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۶۰﴾ عَلٰۤى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿۶۳﴾ ءَاَنْتُمْ
تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿۶۴﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿۶۵﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿۶۶﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿۶۷﴾
اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿۶۸﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ
الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿۶۹﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۰﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿۷۱﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿۷۲﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً
وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿۷۳﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾ فَلَاۤ
اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿۷۵﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿۷۶﴾

(৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (৫৭) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৬৬) বলবেঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্যে সামগ্রী। (৭৪) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (৭৫) অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা-শপথ—যদি তোমরা জানতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলতঃ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ায় এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে, অথবা ভবিষ্যতে হবে, এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ জগৎকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যাকিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে খোদ মানবসৃষ্টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানবসৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফেল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে : اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ –অর্থাৎ, হে মানব, একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদ্র জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোনবস্তু

দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বোঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভ, ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যেন উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি—এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ —(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে একথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব, তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজকারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাকে। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্ত-নাবুদ করে তোমাদের, স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্যকোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারে। وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার ; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড়পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে পারে।

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গুঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যে স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তাআলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্পকারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ – مقوين শব্দটি اقواء থেকে এবং اقواء শব্দটিকে قواء থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে যে, প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ –এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কেয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ – قسم –এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لا والله মুর্খতাযুগের কসমে لا وابي সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সমোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, তোমার ধারণা ঠিক নয় ; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে ; যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَ
رَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ
الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

(৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডানপার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার জন্যে ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

সূরা আল-হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ —যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তানকর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ!

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ —অর্থাৎ, গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে-মাহ্‌ফূয বোঝানো হয়েছে। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। (এক) ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ, 'লওমে-মাহ্‌ফূযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা লওহে-মাহ্‌ফূযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ, লওহে-মাহ্‌ফূযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র লোকগণ'— এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে-মাহ্‌ফূয' পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেয়া যায় না; বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে, অর্থাৎ লওহে-মাহ্‌ফূযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে-মাহ্‌ফূযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। (কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত সম্মানিত শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেরমর্ম— فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (কুরতুবী রুহুল-মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَكْنُونٍ এর বিশেষণ নয়; বরং কোরআনের বিশেষণ।

(দুই) দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইমাম মালেক (রহঃ) ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। — (কুরতুবী)।

কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ বলেন: কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে-আসগর' ও 'হদসে-আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযু অবস্থাকে 'হদসে-আসগর' বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের

পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে 'হদসে-আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(রুহুল-মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَّا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বেওযু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে-মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করতঃ পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন; তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্যে এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে لا يمس القران الا طاهر অর্থাৎ, অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে-কাসীর)

রুহুল-মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে-মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لا يمس القران الا طاهر —(রুহুল-মা'আনী)

মাসআলা ঃ উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে পবিত্রতা শর্ত। এর খেলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা প্রমুখ সবাই এই ব্যাপারে একমত। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযু ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু 'হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহঃ)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযু অবস্থায়ও তেলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে-আব্বাসের হাদীস এবং মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বে-ওযু অবস্থায় তেলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফেকাহ্‌বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ – مدهنون শব্দটি ادهان থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا
إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন শয়তান বা জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। (দুই) কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকৃতি কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে

না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরনোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি আসহাবে শিমাল' তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ — অর্থাৎ উল্লেখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

সূরা আল-হাদীদ

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مسبحات তথা তসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ ও যিকর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। —(ইবনে-কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই — সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট ; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারও কারও মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায় ; যেমন, কেয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না ; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মারেফত।—(রুহুল-মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَ
مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ
أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ
وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

(৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ — এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তাআলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন।

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, একথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এইযে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ -অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - مِيرَاثُ অভিধানে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্তমালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক—মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তাআলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيرَاثُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একদিন

আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে ; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ –অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে-কেরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর একাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى — অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্যমিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয় ; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমতঃ তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবেলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ খোদাভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয় ; رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।